

সচেতন বার্তা

৩য় বর্ষ □ ১০ম সংখ্যা □ জুন ২০১৮



এ সংখ্যায় যারা লিখেছেন

- বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গানে নারী
তিলোত্তমা সেন
- নেতৃত্বে যখন নারী
ড. আলোয়া পারভীন

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গানে নারী

তিলোত্তমা সেন*



আমাদের সংস্কৃতির আবহমান ঐতিহ্যের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রে সংগীতের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বলা চলে “গান হিট তো, সিনেমা হিট”। ‘সুতরাং’ (১৯৬৪) থেকে ‘মনপুরা’ (২০০৯) এ সাক্ষ্যই বহন করে। চলচ্চিত্রে সংগীতের এই বিস্তৃত পরিসরের মধ্য দিয়ে দর্শককে বিনোদন বা “Dramatic relief”-এর অপরিসীম স্বাদ দেয়া যায়। এ সঙ্গে উঠে আসে সমাজ, সংস্কৃতি, মানবীয় সুখ-দুঃখের বিচিত্র আবেগ, জীবনবোধ, সংস্কৃতি বা ভাষাগত নানা পরিবর্তন। নানা উপমায়, উৎপ্রেক্ষায় ভাবানুযুগে আমাদের চলচ্চিত্রের গানে রয়েছে নারীর উজ্জ্বল উপস্থিতি। এই গানগুলিতে নারীকে কখনও দেখি বিরহী, প্রেমসী, প্রণয়ী, প্রেরণাদাত্রী, রহস্যময়ী, লাস্যময়ী কখনো আবার আমাদের ঘরোয়া চিরপরিচিত স্নেহময়ী রূপে। ১৯৫৬ সালে প্রথম সবাক চলচ্চিত্র ‘মুখ ও মুখোশ’^১ এর মধ্য দিয়ে এদেশে চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু।^২ এই চলচ্চিত্রে দুটো গান ব্যবহার করা হয়েছিল।^৩ উষালগ্নের এ চলচ্চিত্রে গানের মধ্যে রয়েছে নারীর উজ্জ্বল উপস্থিতি। ‘আব্দুল আলীমের’ কণ্ঠে বিরহী মনের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশক লোকজ জীবনের প্রতিচ্ছবি সমৃদ্ধ ‘আমি ভীন গেরামের নাইয়া’ গানের মধ্য দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের গানে নারীর যাত্রারম্ভ। খুব সহজ-সরল সুর ও কথায় বিরহী মনের আকুলতা আচ্ছন্ন এ গানে নারী এসেছে চিরপরিচিত ঘরোয়া রূপে। পারিবারিক আবহই এখানে প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

‘আমি ভীন গেরামের নাইয়া-
বাগিজের লাইগ্যা ফিরি-সোনার তরী বাইয়া ॥
গাঁয়ের বধু আউলা চুলে
আসে যখন গাঙের কূলে
আমার ঘরের কথা মনে পড়ে থাকি শুধু চাইয়া ॥
পংখী যদি হইতাম আমি উইড়্যা যাইতাম ঘরে
একলা ঘরে যেথায় বঁধু-কাইন্দ্যা মরে।

আমার গাঁয়ে নদীর ঘাটে, বন্ধুরে...

মোর লাগি তার দিন যে কাটে

কখন আমি দেখা দিব, সেই ঘাটেতে যাইয়া ॥^৪

আব্দুল গফুর সারথীর কথা ও সমর দাসের সুরে বিরহী মনের আকুলতায় আচ্ছাদিত এ গান ‘ভীন গেরামের নাইয়ার’ কণ্ঠে ধ্বনিত হলেও পুরুষের সাথে অবলীলায় এ গানে চলে এসেছে নারীর প্রসঙ্গ। একলা ঘরে পথের দিকে চেয়ে থাকা গাঁয়ের বধু, এলো চুলে নদীর ঘাটে জল নিতে আসা গাঁয়ের বধু এ চিত্রগুলো আবহমান বাংলার চিরাচরিত নারী মূর্তিরই প্রতিনিধিত্ব করে।

আমাদের চলচ্চিত্রের গানে প্রথম যুগ থেকেই দেখি বিষয়বস্তু হিসেবে রোমান্টিকতার প্রাধান্য। এ কারণে নারীকে আমাদের চলচ্চিত্রের গানে সবচেয়ে বেশি দেখা মেলে প্রেমসী, প্রণয়ী বা বিরহী হিসেবে। কাব্যগীতির ধারা সমৃদ্ধ এই চলচ্চিত্রের আরেকটি গান-‘মনের বনে দোলা লাগে- আসলো দখিনা হাওয়া’। মাহবুবা রহমানের কণ্ঠে গীত এ গানে নারী হৃদয়ের অন্তঃস্থলের গভীর ভালোবাসা, রোমান্সের আর্তি পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্ব আর নারী হৃদয়ের সম্পৃক্ততা এ সবকিছুরই প্রতিক্রিয়া বহন করে।

‘মনের বনে দোলা লাগে-আসলো দখিনা হাওয়া
হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর হলো কিরে পাওয়া ॥
ফুলের সুবাস সাথে নিয়ে
বাতায়নে বললো গিয়ে
স্বপন পারের গান যেয়ে মোর হয়নি আজো গাওয়া ॥
বকুল শাখে দোল দিয়ে যায়
মলয় পবনে
তাই দেখে আজ কনকচাঁপা-
হাসে আনমনে;

ঝুমকা ফুল লতার কোলে-সমীরনে দোদুল দোলে
যুথিকা আজ খুললো আঁখি-শিশির জলে নাও’।^৫

নারী হৃদয়ের এই অকারণ পুলক, আনন্দ বিষাদমাখা দোলাচলের, ভালোবাসা প্রকাশের অন্তর্দ্বন্দ্ব, লাজমাখা অন্তর্মুখিতার চিত্র আরো পাই ‘সুতরাং’^৬ (১৯৬৪) চলচ্চিত্রের এ গানটিতেও-

‘পরানো দোলা দিল এ কোন ভোমরা
ফুলের বনে গুঞ্জরিয়া যায় (সেকি)
মনের বনে গুঞ্জরিয়া যায়
হায় কি করি উপায় বলিতে শরম লাগে।
বনের পাখি বনে হারিয়ে যায়
আমার এ আকুলতা কেমনে জানাব আমি যে বুঝিনা।
বলিনি লাজে কেন যে জানি না।’^৮

নারী হৃদয়ের ভালোলাগা, ব্যাকুলতার এই বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই কাগজের নৌকা (১৯৬৬) চলচ্চিত্রের ‘ওগো এমন করে আর বেজোনা,’ হীরামন (১৯৬৭) চলচ্চিত্রের ‘না না না আমি আসব না কথা শুনবো না’, মধুমাল (১৯৬৮) চলচ্চিত্রের ‘আমার মনেরো অঞ্চল দিয়া যে মন বেঁধেছিগো’ প্রভৃতি গানের মধ্যে দিয়ে।

১৯৫৭ সালে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (এফ ডি সি) প্রতিষ্ঠার পর প্রথম নির্মিত ছবি ফতেহ লোহানী পরিচালিত ‘আকাশ আর মাটি’ (১৯৫৯) চলচ্চিত্রের এ গানে নারীকে চিত্রায়িত করা হয়েছে এভাবে-

‘আমার মনের মানসী গান গাইবে
আলসে লালসে
অধরের লীলা তাই
তুমি শুধু চোখ মেলে চাইবে।
আমার পরান নিয়ে
প্রেমের পরশে
চুপি চুপি রূপ ছায়ে ছাইবে।
সরমের মধু রাসি
মরমের রাসা কোণে
বুঝিয়া মনে মনে
রেখ তা সযতনে
আমার গানের ভাষা
জীবনে জাগালে আশা
স্মৃতির সলিলে
একা একা আঁখি জলে নাইবে’।^৯

একই ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ দেখি সুভাষ দত্ত পরিচালিত আয়না ও অবশিষ্ট (১৯৬৭) চলচ্চিত্রের ‘আকাশের হাতে আছে একরাশ নীল’, ‘আমার এ মন আমি যারে দিতে চাই’, নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত ‘অলঙ্কার’ (১৯৭৮) চলচ্চিত্রের ‘আমার কবিতা সে তো কবিতা নয়’ গানের মধ্যে। সত্য সাহার সুরে ড. মোহাম্মাদ মনিরুজ্জামানের কথায় সাবিনা ইয়াসমিন ও খন্দকার ফারুক আহমেদের কণ্ঠে এ গানটি গীত হয়েছিল।^{১০}

চলচ্চিত্রের গানের বিষয়বস্তু যেহেতু অধিকাংশক্ষেত্রে প্রেমনির্ভর, তাই খুব সহজেই বিরহের মূর্তিতে আবৃত নারী অন্তরের ব্যাকুলতা, হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে বাংলা চলচ্চিত্রের অনেক গানেই। অনেক ক্ষেত্রেই গীতিকার আশ্রয় নিয়েছেন সেই চিরায়ত চিরভাস্বর বৈষ্ণব পদাবলীর। ‘রাধা’র সেই চিরায়ত বিরহী রূপের বাতাবরণে চিত্রায়িত করেছেন নারীকে। ‘আসিয়া’ (১৯৬৯) চলচ্চিত্রে রাধারমণের কথা ও সুরে এই গানটি তার অনবদ্য উদাহরণ-

‘আমার গলার হার খুলে নে ওগো ললিতে
আমার হার পরে আর কি হবে সখি
প্রাণবন্ধু নাই ব্রজতে
গলার হারে কি আর শোভা আছে
যার শোভা তার সঙ্গে গেছে গো
এখন কৃষ্ণ নামের মালা গেঁথে
সখি দে না আমার গলেতে
প্রাণের বন্ধু যদি আসে দেশে
বলিস তোরা বন্ধুর কাছে গো
ও রাই কৃষ্ণ বিনা প্রাণ ত্যাগেছে’।^{১১}

‘রাধা’ এখানে আর শুধু পদাবলীর চরিত্র হিসেবেই থাকেনি, চিরায়ত বিরহী নারী মূর্তিরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। একই চিত্রের বহিঃপ্রকাশ দেখি হারানো দিন (১৯৬১) চলচ্চিত্রের ‘বুঝি না মন যে দোলে বাঁশীরও সুরে’ ‘অনেক দিনের চেনা’ (১৯৬৪) চলচ্চিত্রের ‘ডেকোনা ডেকোনা ও বাঁশী এখনো ডেকো না’, ‘আনোয়ারা’ (১৯৬৭) চলচ্চিত্রের ‘মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব কানু হেন গুণনিধি করে দিয়ে যাব’ প্রভৃতি গানে। বিরহী রূপের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় আনোয়ারা (১৯৬৭) চলচ্চিত্রের এ গানে-

‘আমি কেন তারে মন রে দিলাম
প্রাণ দিলাম নিদয়া আরে ও আমার কাইন্দা জনম যায়।
আমার ঘরের জ্বালা পরে জ্বালা জ্বালা তব ঠাঁই
জ্বালায় জ্বালায় সোনার দেহ পুইড়া হলো ছাই
অবলা নারীর জ্বালা
কে বুঝিতে পারে
কারে কবো দুঃখের কথা কে আছে সংসারে
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি হেন জনতো নাই।
জোছনা পুরিতে আমি ঘুইরা ফিরি নায
নিবা আগুন জ্বলে দ্বিগুণ সাম্পানের ঠাঁই।
আগুন নিবাইব কোথায় গিয়া কে বলিবে কি উপায়
বন্ধুর দেখা পাব বলে আইলাম নদীর কূলে
আসা যাওয়া সাক্ষী রইলো বন্ধু গেল চলে

ধিকি ধিকি তুষের অনল বকের মাঝে জ্বলে
ঝাঁপ দিয়া জুড়াইব জ্বালা এই না গহিন জলে
দয়াল কে আছে মোর ব্যথার সাথী তুমি বিনে দুনিয়ায়।^{১৩}

মৈমনসিংহ গীতিকার মত নানা উপমার প্রয়োগে রচিত এ গানে নারী হৃদয়ের বিরহবিধুর মূর্তি খুব স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে অঙ্কিত হয়েছে। নারীর এ বিরহী চিত্তের প্রতিফলনের প্রতিচ্ছবি দেখি ‘আপন দুলাল’ (১৯৯৬) চলচ্চিত্রের ‘ও বন্ধুরে-/ প্রেম দরিয়ার এত যে ঢেউ আগে না জানিতাম’, ‘বাল্যবন্ধু’ (১৯৬৮) চলচ্চিত্রের ‘ও কি গাড়িয়াল ভাই’, ‘মনপুরা’ (২০০৯) চলচ্চিত্রের ‘আগে যদি জানতামরে বন্ধু তুমি হইবা পর’ প্রভৃতি গানেও।

নারীর বিরহী রূপের পাশাপাশি লাস্যময়ী বা রহস্যময়ী রূপের উপস্থাপনও আমাদের চলচ্চিত্রের নেহাত কম নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য-

‘আমি রূপ নগরের রাজকন্যা রূপের যাদু এনেছি
ইরান তুরান পার হয়ে আজ তোমার দেশে এসেছি।
নয়নের বান দিয়ে গো যৌবনের দোল দিয়ে গো নুপুরের তালে তালে
তোমায় আমি বেঁধেছি জানি গো জানি আমি তোমারে যে বেঁধেছি।
সবার চোখে রং লাগিয়ে সবার মনে ঢেউ জাগিয়ে
নতুন দেশের পথে আমি আজকে আবার চলেছি
জানি গো জানি সবার মনকে নিয়ে চলেছি’।^{১৪}

‘হারানো দিন’ (১৯৬১) চলচ্চিত্রের নিরীক্ষাধর্মী এ গানের গীতিকার ও সুরকার ছিলেন যথাক্রমে আজিজুর রহমান ও রবীন ঘোষ। গানটি গীত হয়েছিল ফেরদৌসী রহমানের কণ্ঠে। কাওয়ালী গানের গতি আর চৈতী গানের উচ্ছল সুর প্রয়োগে যন্ত্রানুসঙ্গের নতুনত্ব গানটির সুরে যেমন নতুনত্বের সৃষ্টি হয়েছিল বানীর ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য এনেছিল।^{১৫} পরবর্তী সময়ে অনেক গানেই নারীর দৈহিক রূপ বর্ণনার প্রসঙ্গ এসেছে। নিতান্ত ঘরোয়া বা বিরহী সাধাসিধে প্রণয়াস্পদ রূপের পাশাপাশি লাস্যময়ী বা চটকদার রূপে নারীর উপস্থাপনের সূত্রপাত এই গান।

জহির রায়হান পরিচালিত পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর^{১৬} ‘বেহুলা’ (১৯৬৬) চলচ্চিত্রের ‘ও বেহুলা সুন্দরী’ গানটিতেও খুব আকর্ষণীয়ভাবে গীতিকার আঙ্গিকে এবং অসংখ্য উপমার প্রয়োগে এসেছে ‘বেহুলা’ অর্থাৎ নারীর রূপ বর্ণনা। আলতাফ মাহমুদের সুরে শাহনাজ রহমতুল্লাহর কণ্ঠে গীত হয়েছিল এ গানটি।

‘ও বেহুলা সুন্দরী ও বেহুলা নানুনা
তোমার রূপের কথা দেশ দেশান্তরে জানেন সকলে

ওরে কুচবরণ কন্যারে তর মনে কত রঙ্গ
ডাগর ডাগর দেহখানি চিকন অঙ্গরে
মেঘ বরণ কেশ পুর বিজলি সদাই হাসে
ডালিম ডালিম বকের নীচে ক্ষীরের সাগর ভাসে।
কাজল বরণ নয়নের তর যেন ধারাল বটি
লাজুক লাজুক চলনের তর কঞ্চি চিকন কটিরে’।^{১৭}

পরবর্তী সময়ে রূপক বা উপমাশ্রিত নারী সৌন্দর্যের এই বর্ণনা নিতান্ত দেহজ বর্ণনায় পরিণত হয়েছে। সময়ের সাথে নারীর মন ও মানসের বা তার কাজের পরিধির ব্যাপ্তি ঘটলেও চলচ্চিত্রে বা চলচ্চিত্রের গানে তার কোনো প্রতিফলন নেই। চলচ্চিত্রের কাহিনি বা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেমন আমাদের আধুনিকতার ছোঁয়ার অভাব আছে সেই অভাব আছে সময়ের সাথে পরিবর্তিত আধুনিক নারীর উপস্থাপনও। শুধু পোশাকের পরিবর্তন আধুনিকতা বা পরিবর্তনের মানদণ্ড হতে পারে না। যুগের সাথে নারীর পোশাকের পরিবর্তন চলচ্চিত্রের গানের দৃশ্যায়নে ব্যবহৃত হলেও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন নারীর উপস্থাপন খুব বেশি চোখে পড়ে না। আমাদের চলচ্চিত্রের গানে নারীকে অনেক ক্ষেত্রেই উপস্থাপন করা হচ্ছে মূলধন উঠিয়ে আনার তুরূপের তাস হিসেবে। চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে অর্থাৎ ষাটের দশকে কিছুটা রাখ-ঢাক থাকলেও পরবর্তীতে নারীর অন্য যে কোন রূপের চেয়ে দেহজ বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সময়ের পরিবর্তন, আমাদের মানসিকতা, পরিচালক-দর্শক উভয়ের ভূমিকা, আকাশ সংস্কৃতি সবকিছুই এখানে ইন্ধন জুগিয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য-‘জরিলা সুন্দরী’ (১৯৬৬) চলচ্চিত্রের ‘আমার মন বনে ফুল ফুটেছে/ ভ্রমর মধু নিওনা.... এ যৌবন তোমারি আশে ভ্রমর ব্যথা দিও না...যৌবনেরি ঢেউ জেগেছে যৌবনে ঢেউ জেগেছে/ ভ্রমর বাঁধ মানে না’^{১৮}, ‘ময়ূর পংখী’ (১৯৬৭) চলচ্চিত্রের ‘আহারে সোনার যৈবন বইয়া যায় রে’, ‘এ মায়াবী আঁখি দু’টি শুধু যে বলে আরো কাছে এসে’^{১৯}, ‘শহীদ তীতুমীর’ (১৯৬৮) চলচ্চিত্রের- “আ-আ-আ-আ এনেছি রূপের ডালি/ রংগের মেলায় গো বিকাতে এনেছি এই মুখের মেলায়/ তনুতে তনুতে আজ সুধা উছলায়’^{২০}, ‘সাত ভাই চম্পা’ (১৯৬৮) চলচ্চিত্রের- ‘জ্বালাইলে যে জ্বলে আগুন নিভানো যে বিষম দায়/ আগুন জ্বালাইস না আমার গায়’, ‘নিশান’ (১৯৭৭) চলচ্চিত্রের- ‘হায় হায়রে ও রাজা এই রাত্রে/সবই যে তোমার, যৌবন যে চল চল তোর’ ‘দ্বীপকন্যা’ (১৯৮৪) চলচ্চিত্রের- হাঃ হাঃ হাঃ পাকা টসটসে আঙ্গুর রসে টইটুমুর/ও রসিয়া একটা খেলেই হবে নেশায় চুর’, ‘নরম গরম’ (১৯৮৪) চলচ্চিত্রের- ‘এই নিশি রাইতে তোমার ঘরে যাইতে মন যে উথাল পাখাল করে বধূয়া’, ‘অহিংসা’ (১৯৮৫) চলচ্চিত্রের-‘ওরে ও রূপকুমারী মারিস না মনে ছুরি’, ‘হো আ শোন.... আ হো লায়লা/ হা দে দোল হা দে দোল হা খেলা হবে’, ‘হায়, হায় মিঠা লাগে যত ব্যাথা দিসরে কালা/যৌবন যে চল চল তোর

কি লাগে না ভাল/ জাগে না তোর মনে ঢেউ তুই যে কেমন মরদ’, ‘বাবার আদেশ’ (১৯৯৫) চলচ্চিত্রের- ‘ও মিয়াজান, ও ভাইজান আসেন, রস খাইয়া যান/ রসে রসে টস্ টস্ আমার গেভারী’, ‘অজানা শত্রু’ (১৯৯৬) চলচ্চিত্রের- ‘ওরে লাউয়ার বৈরাগী/ দিসনে দিসনে ফাঁকি/ মতলব তোমার জানতে আমার নাইরে নাইতো বাকি/ ডালিম গাছের এ কাঁচা-কলি/ ডাল ভাইঙ্গোনা ঐ মনের মালি/ হাত পড়াইলে/ কাছে আইলে/ লজ্জা কি দিয়া ঢাকি’^{২১}, ‘শত্রু ধ্বংস’ (১৯৯৯) চলচ্চিত্রে- ‘ভালোবাসো আমারে, একটু প্রেম দাও আমারে/ মাইয়াটা চোখ মারলে, কইলজার ভিতরে গুলিট লাগে’, ‘নারীর মন’ (২০০০) চলচ্চিত্রের- ‘ঝাকানাকা ঝাকানাকা দেহ দোলা না/ মন বলে মন বলে দেহ দোলা না’/ মীরাবাঈ হেইল্যা, দুইল্যা, দরবার নাচায়’, ‘নাগ নাগিনীর স্বপ্ন’ চলচ্চিত্রে- ‘ওরে ও দুষ্ট পানি, এখন আমার ভরা জওয়ানি/ নিভিয়ে দে অঙ্গের আঙুন/ আয়রে আয় প্রেমের নাগ, দে অঙ্গে দে ছোবলেরই দাগ’, ‘বর্ষা বাদল’ (২০০০) চলচ্চিত্রের- ‘ঝিলিক মারে/ রূপ আমার চান্দের মত শুধু ঝিলিক মারে/ মনটা আমার গাঙের মত উখাল পাখাল করে/ বন্ধু বিনে এই বয়সে কেমনে থাকি ঘরে’, ‘এরই নাম দোস্তী’ (২০০০) চলচ্চিত্রে- ‘রসের কোমড়াটা নাচিয়ে/ কচি কচি অঙ্গ দুলিয়ে/ সবকিছু দেব আমি বিলিয়ে’, ‘ইবলিশ’ (২০০১) চলচ্চিত্রের- ‘এ দিলে রঙ লেগেছে, যৌবনে ঢেউ জেগেছে/ মিলনের ডাক এসেছে/ দিবরে দিবরে দিব/ মন দিব, সব দিব রে’, ‘দিলতো পাগল’ (২০০১) চলচ্চিত্রের- ‘অঙ্গ যে জ্বলে যায়, এ আঙুনকে নিভায়’, ‘বস্তির মেয়ে’ (২০০১) চলচ্চিত্রে- ‘তুই হইলি বোম্বাই মরিচ গরম মসলা’, ‘বিপণ্ডবী জনতা’ (২০০১) চলচ্চিত্রের- ‘আইল্যারে কই গেলি আইল্যারে/ কি শরবত দিল আমায় ঢাইল্যারে/ নিশা লাইগ্যা যায় আমার এ কলিজায়/ সোনার অঙ্গ যায় জ্বইল্যারে’, ‘মাস্তান নাম্বার ওয়ান’ (২০০৫) চলচ্চিত্রের ‘যৌবনটা পাগলা হাওয়া, করবরে তোরে ধাওয়া’, ‘সাথী তুমি কার’ (২০০৬) চলচ্চিত্রে- ‘মনটা ছুইমুই করে তোমার দেখার পর/ চোখের ভাষা পড়ো তুমি, জলদি প্রেম করো তুমি/ আশেপাশে কেউ তো নেই, ভয়টা কিসের/ ও মরি প্রেমের বিষে।’

এই ধরনের গান গুলোতে নারীর লালিত্যময়, কমণীয় রূপের চেয়ে গানের আইটেম হিসেবে উপস্থাপনের দিকেই ঝোঁক বেশি লক্ষণীয়। ষাট বা সত্তর দশকের চটুল কথাশ্রিত অনেক গানের দৃশ্যায়নের ক্ষেত্রে চটুল গানকে পরিশীলিত বা মার্জিত ধারায় পরিবেশনের একটা রীতি ছিল কিন্তু আশি বা নব্বইয়ের দশকে এসে দৃশ্যায়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় ভিন্নতা। চলচ্চিত্রে গান কেবল শোনার বিষয় নয়, দেখারও বিষয়। তাই কুরচিপূর্ণ দৃশ্যায়নের জন্য অনেক গানেই নারীকে শুধু অশ্লীল উপকরণ বা নিতান্ত দেহ নির্ভর ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। পরিসর কম হলেও নারীকে আরো বিচিত্রভাবেও উপস্থাপন করা হয়েছে আমাদের চলচ্চিত্রের গানে। ‘আসিয়া’ (১৯৬০)

চলচ্চিত্রের এ কর্মসংগীতে ঘরোয়া, সাংসারিক অতিথিপরায়াণ, প্রতিদিনকার খুব চেনা নারীর প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়েছে-

‘ধান বানি আমি নারী ওড়ুম কি গাইনে/ লিডিডম কি গাডডাম করিয়া রে/ চাউল ঝাড়ি আমি নারী কূলায় কি ঝাড়নে/ বুরু কি ঝাররাম করিয়ারে/ আর্শি-পড়শি আসে যায় পিড়া দিলে বসে খায়/ গুররত কি শাররাত করিয়ারে/ নয়া ধানের নতুন চাউল শিল্পি ভাতে রাঁধিরে/ সাপপাউ কি চাপপাউ করিয়া রে।’^{২২}

নারী রূপের বহুমাত্রিকতার মধ্যে খুব চলে আসে তার স্নেহময়ী রূপের প্রসঙ্গ। কখনো মা, কখনো বোন, কখনো ভাবী পারিবারিক স্নেহময় আবেগ আর আবেশ মাখা নারীর এ চিত্রগুলো আমাদের চলচ্চিত্রের গানে বাদ পড়েনি। নারীর মাতৃত্ব অনেক চলচ্চিত্রের গানেই এসেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য-

‘সমাধি’ (১৯৭৬) চলচ্চিত্রে খুরশিদ আলমের কণ্ঠে পাশ্চাত্য চলনের ‘মাগো মা ওগো মা আমারে বানাইলি তুই দিওয়ানা’, ‘মতিমহল’ (১৯৭৭) চলচ্চিত্রের- ‘মাগো তোর চরণ তলে বেহেস্ত আমার’, ‘বর্তমান’ (২০০০) চলচ্চিত্রের ‘মায়ের একধার দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম পাপোষ বানাইয়া দিলেও শোধ হবে না’ প্রভৃতি।

গীতিকার মাজহারুল আনোয়ার ও সত্য সাহার সুরে সত্য সাহার কণ্ঠে গীত ‘আবির্ভাব’ (১৯৬৮) চলচ্চিত্রের ‘ভাবী যেন লাজুকলতা ছলাকলা কিছুই জানেনা’ গানটিতেও চিরাচরিত স্নেহময়ী নারীমূর্তির প্রতিচ্ছবি হিসেবেই নারীকে উপস্থাপনা করা হয়েছে।^{২৩} এ রকম পারিবারিক আবহে ঘেরা নারীর রূপ আরও দেখি ‘দুই ভাই’ (১৯৬৮) চলচ্চিত্রের- ‘ভাবী তোমার পাঠশালাতে ভর্তি হলো ভাই’, ‘রজনীগন্ধা’ চলচ্চিত্রের রুনা লায়লার কণ্ঠে- ‘ও মিষ্টি ভাবীরে, ও লক্ষী ভাবীরে লজ্জা কেন পাও’, প্রভৃতি গানের মধ্যে।

নারীর আরেকটি স্নেহময় অনবদ্য, মায়া-মমতা মাখা রূপ ‘বোন’। এ প্রসঙ্গে লতা মুঙ্গেশকরের কণ্ঠে গীত ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় নির্মিত ‘রক্তাক্ত বাংলা’^{২৪} (১৯৭২) চলচ্চিত্রের এই গানটির কথা উল্লেখ না করলেই নয়-

‘দাদাভাই, ও দাদাভাই মূর্তি বানাও
নাক, চোখ, মুখ সবই বানাও
হাতও বানাও, পা-ও বানাও
বৌদ্ধ, যীশু সবই বানাও
বোন বানাতে পারো কি একটা ছোট
বোন বানাতে পারো কি।’^{২৫}

আমাদের চলচ্চিত্রের গানে নারীকে বিরহব্যথায় আপ্ত,

শ্রেয়সী, শ্রেয়াদাত্রী, স্নেহময়ী, লাস্যময়ী, চিরপরিচিতি, রহস্যময়ী, আদৃতা, আশ্রিতা প্রভৃতি বহুমাত্রিক রূপে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি নারীকে নিতান্ত ঘরের বা মনোরঞ্জনের গন্ডি থেকে বাইরে এনে দেশের সাথে একাত্ম করেও দেখানো হয়েছে। দেশকে মাতৃভাবে ভালোবাসা বা দেশ মাতা আর জন্মদাত্রী মা-কে এক করে দেখা বাংলা গানে কোন নতুন বিষয় নয়। স্বদেশী গানের এ রূপটির প্রতিফলন আমাদের চলচ্চিত্রের গানেও প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য করা যায় খান আতাউর রহমান পরিচালিত বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনানির্ভর চলচ্চিত্র ‘নবাব সিরাজউদ্দৌলা’^{২৬} (১৯৬৭) চলচ্চিত্রের-

‘ও আমার জন্মভূমি মাগো মা তোমারেই সবার চেয়ে আপন জানি
তোমারই বাউল বাতাস মেঘলা আকাশ
কি যে মায়া ভরা অবিরত
তোমারই ধানের ক্ষেত্রে শ্যামল মাঠে কি যে মায়ের বুকের মত
তোমারই স্নেহ ভরা মায়া ভরা মাটিরে
তোমারই সবুজ প্রাণ কি যে ব্যথা লাগে মনে তোমারই অশ্রুঝরা নয়নে
কি যে ব্যথা আনে প্রাণে ও আমার জন্মভূমি মাগো মা’^{২৭}

জহির রায়হান পরিচালিত বাংলাদেশের প্রথম রাজনৈতিক চলচ্চিত্র ‘জীবন থেকে নেয়া’ (১৯৭০)-তে ব্যবহৃত খান আতাউর রহমানের সংগীত পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের “আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি” গানেও দেশ আর মায়ের মধ্যে অভিন্ন রূপ কল্পিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে এই গানটি স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি পায়।^{২৮}

চলচ্চিত্র শুধু নিছক বিনোদন নয় যেহেতু এর সংগঠন ও প্রভাবনী ক্ষমতাও যথেষ্ট রয়েছে তাই চলচ্চিত্রের সমাজের প্রতি কিছু দায়বদ্ধতা থেকেই যায়। শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রেও অঙ্গীকারের প্রশ্ন চলে আসে। আর চলচ্চিত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে গান থাকার কারণে চলচ্চিত্রের সংগীতও সে দায়বদ্ধতা এড়াতে পারে না। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বা চলচ্চিত্রের গানের ক্ষেত্রে যেমন নারী চরিত্র একটি বিশেষ ভূমিকা বহন করে সমাজ জীবনেও নারীর অংশগ্রহণ বা অবস্থান তার চাইতে কোন অংশেই কম নয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে অশ্লীল, ভাঁড়ামি, আর যৌবনাবেগসর্বস্ব উপকরণ হিসেবে। কিন্তু নারী শুধু বিনোদনের রসদ নয়। নারীর রয়েছে বহুমাত্রিক রূপ। একই ধরনের চিত্র ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার দেখানো চলচ্চিত্র, সমাজ, নারী কারো জন্যই মঙ্গলময় বা আশাব্যঞ্জক নয়। সময়ের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিকতা, সমাজ, বদলে যায়।

বদলে যাওয়া সমাজেও কিছু আবহমানতা, মূল্যবোধ চিরকালীন ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে হয়। তাই চলচ্চিত্রের গানেও নারীর প্রেমাস্পদ, স্নেহময়ী, বিরহী রূপের পাশাপাশি নারীর মর্যাদা, প্রগতি, ক্ষমতায়ন এবং নারীর অন্তরদর্শনের কথাও সময়ের চাহিদানুসারে আসা উচিত বলে মনে করি।

তথ্যসূত্র ও টিকা নির্দেশ :

১. দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়া বা টানা সংলাপের একঘেয়েমি দূর করার জন্য গানের ব্যবহার।
২. ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক কাহিনিচিত্রটি নির্মিত হয়েছিল ফরিদপুরে সংঘটিত একটি ডাকাতির কাহিনিকে উপজীব্য করে। আবদুল জব্বার খান (১৯১৬-১৯৯৩) নিজের লেখা ‘ডাকাত’ নাটকের (পরবর্তী সময়ে উপন্যাস হিসেবে প্রকাশিত) কাহিনি অবলম্বনে ‘মুখ ও মুখোশ’ নামে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। কাহিনি, চিত্রনাট্য, রচনা এবং পরিচালনার পাশাপাশি আবদুল জব্বার খান এ চলচ্চিত্রে অভিনয়ও করেন। এ চলচ্চিত্রের অন্যান্য অভিনয়শিল্পীরা হলেন- ইনাম আহমেদ, পূর্ণিমা সেন, নাজমা (পিয়ারী), জহরত আরা, আলী মনসুর, সফিউদ্দিন আহমদ, কাজী খালিক প্রমুখ। ইকবাল ফিল্মস পরিবেশিত ৯৯ মিনিটের এ চলচ্চিত্রটি ১৯৫৬ সালের ৩ আগস্ট ঢাকার রূপমহল, চট্টগ্রামের নিরাদা, নারায়ণগঞ্জের ডায়মন্ড, খুলনার উল্লাসিনী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। চলচ্চিত্রটির নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল ১৯৫৩ সালে। চলচ্চিত্র স্টুডিওর অভাব, ভালো ক্যামেরা, চিত্রগ্রাহকের অভাব প্রভৃতি শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এ ছবিটি নির্মিত হয়েছিল পরিচালকের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং অনেকটা দায়বদ্ধতা থেকে। এ ছবির মাধ্যমে তিনি পাকিস্তানিদের বাঙালি ও বাংলাদেশ-বিদ্বেষী মনোভাবের বিরুদ্ধে জবাব দিয়েছেন। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চলচ্চিত্র নির্মাণ অসম্ভব, পাকিস্তানিদের এরূপ বিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদের স্মারক হিসেবেই মূলত ‘মুখ ও মুখোশের’ জন্ম। ঢাকায় সে সময় চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ-যন্ত্রপাতি বা লোকবল যেমন ছিল না, ছিল না দক্ষ অভিনয় শিল্পীও। এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক দক্ষতাও ছিল না কিন্তু শুধু স্বজাত্যবোধ ও দেশপ্রেমের জন্যই অদম্য মনোবলকে সঙ্গী করে অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করেছেন তিনি।
৩. ইসলাম, শরাফুল (১৯৯৫), মুখ ও মুখোশের ছেঁড়াপাতা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৫৯।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
৭. সুভাষ দত্ত পরিচালিত এই চলচ্চিত্রটি শুধু ১৯৬৪ সালের হিসেবেই নয় বরং বাংলা সিনেমার যাত্রার শুরুর দিক থেকেও উর্দু এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রতাপের মধ্যেও ‘সুতরাং’ কে বলা চলে প্রথম ব্যবসা সফল ছবি এবং এর সফলতার পেছনে ছিল এর গানগুলো। গানগুলোর জনপ্রিয়তার ভেলায় ভর করেই সিনেমাটি দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছিল। এ সিনেমার গীতিকার ছিলেন সৈয়দ শামসুল হক এবং সুরকার ছিলেন

সত্য সাহা। ফ্রান্সফুর্ট এশীয় চলচ্চিত্র উৎসবে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছিল।

৮. বেগম, আজিজা (সংগ্রাহক) (১৯৮০), জুলাই, সচিত্র সিনেমার গান, সুলভ পুস্তিকা, বরিশাল, পৃ. ৪৪।

৯. চৌধুরী, সুমন (২০০৭), ডিসেম্বর, বাংলা চলচ্চিত্রের গান, শাহীন, ইসরাফিল (সম্পাদিত), বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা, খন্ড-১২, পরিবেশন শিল্পকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ১৮২।

১০. বেগম, আজিজা (সংগ্রাহক), সচিত্র সিনেমার গান, পৃ. ৫।

১১. বাগচী, তপন (২০১০), জুন, চলচ্চিত্রের গানে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, পৃ. ৮২।

১২. বেগম, আজিজা (সংগ্রাহক), সচিত্র সিনেমার গান, পৃ. ১৭০।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

১৫. চৌধুরী, সুমন, বাংলা চলচ্চিত্রের গান, শাহীন, ইসরাফিল (সম্পাদিত), বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা, পৃ. ১৮৩।

১৬. প্রথমে লোকজ কাহিনি হিসেবে প্রচলিত ছিল পরবর্তীকালে লোক কাহিনিটিই পদ্মপুরানে স্থান পেয়েছে।

১৭. বেগম, আজিজা (সংগ্রাহক), সচিত্র সিনেমার গান, পৃ. ৯২।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

২১. বাগচী, তপন, চলচ্চিত্রের গানে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পৃ. ১৫০।

২২. বেগম, আজিজা (সংগ্রাহক), সচিত্র সিনেমার গান, পৃ. ১৬৮।

২৩. চৌধুরী, সুমন, বাংলা চলচ্চিত্রের গান, শাহীন, ইসরাফিল (সম্পাদিত), বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা, পৃ. ১৮৫।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

২৫. তাহের, আবু (সম্পাদিত) (১৯৭২), নতুন ছায়াছবির গান, ক্রাউন বুক ডিপো, ঢাকা, পৃ. উল্লেখ নেই।

২৬. ইসলাম, আহমেদ আমিনুল (২০০৮), বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩৩।

২৭. বেগম, আজিজা (সংগ্রাহক), সচিত্র সিনেমার গান, পৃ. ২২।

২৮. হায়াৎ, অনুপম (২০১২) জানুয়ারি, রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১২৫।

***প্রভাষক, সংগীতের ইতিহাস বিভাগ
সরকারি সংগীত কলেজ, ঢাকা**

নেতৃত্বে যখন নারী

ড. আলোয়া পারভীন*



নেতৃত্ব একটি সামাজিক গুণ। দেশ ও জাতির কল্যাণে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যখন নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন তাকে নারী নেতৃত্ব বলে। দেশের জনগণ যখন কোন নারীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্মোহিতের মত তাকে মেনে চলতে থাকে এবং দেশের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে তার গৃহীত নীতি ও পদক্ষেপসমূহের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে তখনই নারী নেতৃত্বের প্রকাশ ঘটে। নারী নেতৃত্ব তার ত্যাগ, প্রেরণা ও নৈতিকতা দিয়ে জাতিকে সুসংঘবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করে জনগণের আস্থা অর্জন করেন।^১ যদিও একথা শোনা যায় যে ইসলামে নারী নেতৃত্ব হারাম বা নারী নেতৃত্ব নিষিদ্ধ। রাজনৈতিক অঙ্গনেও ধর্মভিত্তিক দলগুলো নারী নেতৃত্ব পছন্দ করে না। সমাজে নারীদের কীরূপে চলতে হবে সে বিষয়ে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ফর্মুলা বা তত্ত্বও দিতে দেখা যায়। এমনকি দেয়ালে চিকা মারা “নারী নেতৃত্ব চাইনা, মাতৃত্ব চাই”- এই জাতীয় বাক্যও লক্ষ করা যায়। এছাড়া সমাজেও প্রচলিত বিশ্বাস এই যে নারীরা নেতৃত্বে দক্ষ নয়, নারীরা রাজনীতি করলে সংসারে অশান্তি দেখা দেয়। সন্তানাদি মানুষ হয় না। তাই নারীদের সাংসারিক ধর্ম পালন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কাজেই এ বিষয়ে জানতে উপমহাদেশের রাজনীতিতে নারীর ঐতিহাসিক অবস্থা ও অবস্থান জানা উচিত।

রাজনীতিতে কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্ব বিংশ শতাব্দীর আগে ছিল না। ভারতবর্ষের প্রথম নারী শাসক সুলতানা রাজিয়া ইলতুৎমিশের পুত্রগণের চেয়ে বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও যোগ্য ছিলেন। তাই ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর তিনি ভারতবর্ষের মসনদে বসেন। কিন্তু তখনকার ওলামা সমাজ নারী নেতৃত্ব মেনে না নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও নিন্দা জানান। কিছুদিন মসনদে থাকার পর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আলতুনিয়ার সাথে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন সুলতানা রাজিয়া, বন্দীত্ব থেকে মুক্তি লাভের জন্য আলতুনিয়াকে বিয়ে করেন তিনি কিন্তু বিদ্রোহীরা আলতুনিয়াকে হত্যা করে এবং রাজিয়ার ভাইকে ভারতবর্ষের মসনদে বসায়। তখন থেকে ভারতবর্ষে নারী শাসনের অবসান ঘটে।^২

সুলতানা রাজিয়া শুধু ভারতবর্ষের প্রথম নারী শাসক ছিলেন না, সারা বিশ্বেরও। এরপর পৃথিবীর দ্বিতীয় নারী শাসক শ্রীলঙ্কার বন্দর নায়েক। অতঃপর ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হন ইন্দিরা গান্ধী। বাংলাদেশে খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী হন, শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে। এশিয়ায় বিংশ শতকে নারী নেতৃত্ব বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানের বেনজীর ভুট্টো, শ্রীলঙ্কার কুমারাতুঙ্গা,

ফিলিপাইনের কোরাজন একেইনো, বার্মার সুকি; এ রকম বেশ কিছু নারী রাষ্ট্র-প্রধানের আবির্ভাব ঘটে এশিয়ায় যা এককালে ছিল অভাবিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী শাসনের অধীনে নারীই বেশি নির্যাতিত হয়, বঞ্চিত হয় তার অধিকার থেকে; ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ এখানে পুরুষতন্ত্রের প্রথা ও বিধান মতে তাকে রাষ্ট্র চালাতে হয়, তাই নারী শাসনের অধীনে নারীমুক্তি কখনো সম্ভব নয়। কেননা ধর্মও পুরুষতান্ত্রিক বিধি-বিধানকে উৎসাহিত করেছে এবং নারী নেতৃত্ব বা নারীর শাসনকে নিরুৎসাহিত করে। আর এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কও রয়েছে। কেউ কেউ নারী নেতৃত্বকে হারাম বলেও গণ্য করেন। নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে হাদিসটি ছিল এরূপ: এমন কোনো মহান সমাজ নেই যে নারী নেতৃত্ব বিদ্যমান-বুখারী। ঐতিহাসিকভাবে এই হাদিসের উপর ভিত্তি করেই মূলত জাতীয় বা রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীদের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তবে ইমাম আবু হানিফা ও আল তাবারি এর ব্যতিক্রম মত পোষণ করেন।^৭

ইসলামি প্রজাতন্ত্র বা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের নির্বাচনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাষ্ট্রপ্রধান পদে মহিলা নির্বাচনের প্রশ্ন দেখা দিলেই একশ্রেণির আলেম এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খান ও মিস ফাতেমা জিন্নাহ অংশ নেন। তখন বেশিরভাগ আলেম ফাতেমা জিন্নাহর প্রার্থীতাকে শরিয়তবিরোধী বলে ফতোয়া দেন। তবে কয়েকজন তাঁর পক্ষাবলম্বন করেন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সামনে রেখে।

কোরান-এ বর্ণিত নারীশাসক বিলকিসের রাজ্যশাসনকে ভিত্তি করে একাধিক ইসলামি গ্রন্থপ্রণেতা মাওলানা আশরাফ আলী খানভী ফতোয়া দেন : ‘.....উসূলে ফেকাহর সুবিদিত বিধান হচ্ছে, কোরান বা হাদিসে যদি অতীতের কোন ঘটনা বা ব্যবস্থাকে কোনরূপ অবজ্ঞা বা অসমর্থন প্রকাশ না করে বর্ণনা করা হয় তবে তা শরিয়তে প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে। সুতরাং কোরানের বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মহিলার নেতৃত্ব চলতে পারে।’ (ইমদাদুল ফাতাওয়া তাতিন্যায়ে ছানিয়া, দৈনিক আজাদ ২২ অক্টোবর ১৯৬৪)। রাজনীতিক ও বিতর্কিত ইসলামি শরিয়ার ব্যাখ্যাকার মাওলানা আবুল আ’লা মওদুদীর ফতোয়া ছিল এরকম :যদি দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনকে গ্রহণ করার প্রশ্ন দেখা দেয়, দু’জনের মধ্যে একজনকে অনিবার্যভাবে কবুল করে নিতে হয়, আর তাদের মধ্যে একজনের মধ্যে নারী হওয়া ছাড়া অন্য কোন আপত্তিকর জিনিস না থাকে এবং অপরজনের মধ্যে কেবল পুরুষ হওয়া ছাড়া অন্য সবদিকই হয় মারাত্মকভাবে আপত্তিকর, তাহলে ইসলামে জ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তি কি আমাদেরকে নারী গ্রহণ না করে সেই পুরুষকেই গ্রহণ করার জন্য বলতে পারে? নারীর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া

সংক্রান্ত বিষয়ে শরিয়তের দৃষ্টিতে এই হচ্ছে প্রকৃত অবস্থা’। (২৯ নভেম্বর ১৯৬৪, ঢাকার পল্টন ময়দানে প্রদত্ত বক্তৃতাংশ)।^৮ তাই প্রশ্ন জাগে “নারী নেতৃত্বের প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা কি কোরান ও হাদিসের শিক্ষা অনুসারে করা হয়েছে?” যতদূর জানা যায় কোরানের এমন কোনো আয়াত অথবা হাদিস পাওয়া যাবে না যেখানে নারী নেতৃত্বের বৈধতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদিও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের অনেকেই উল্লেখিত হাদিস কে বৈধ বলে মনে করেন তবুও এ ব্যাপারে কিছু আপত্তির কথা বলা সঙ্গত^৯ :

প্রথমত, এটি একটি বিচ্ছিন্ন হাদিস। হাদিস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক হাদিস ভাষ্যকারদের কাছে এটি অর্পিত না হয়ে একজন মাত্র ব্যক্তি এটি জারী করেন। ফলে হাদিস বিশেষজ্ঞরা এর পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান করেন না। এর অর্থ রসুল (দ:) এটা বলেছেন এই মর্মে আমরা চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি না।

দ্বিতীয়ত, রসুল (দ:)- এর মৃত্যুর ২৩ বছর পর আবু বকরা এই হাদিসটি বর্ণনা করেন। ঐ সময়ের একজন সাহাবীও গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ এই হাদিসটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

তৃতীয়ত, এই হাদিসের ভাষ্যকার এমন একসময়ে এই হাদিসটি বর্ণনা করেন যখন আয়েশা (রা:) ও আলী (রা:)-এর মধ্যকার বিরোধ চরমে।

চতুর্থত, এর ভাষ্যকারের মতে, রসুল (দ:) পারস্য সাম্রাজ্য সম্পর্কে এই হাদিসটি বলেছিলেন। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন পারস্য সম্রাট ইসলাম সম্পর্কে প্রবল ঘৃণা পোষণ করতেন।

নামাজে নারীদের ইমামতি করার অধিকারের বিষয়টির ক্ষেত্রেও পুরুষ পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি উপস্থিত। জাবির বর্ণিত হাদিসের শিক্ষা এর সঙ্গে যুক্ত। বলা হয়েছে : “একজন নারী কখনো পুরুষের নামাজে ইমামতি করতে পারবে না” [ইবনে মাজহা]। ইসলামের সব মাজহাবই পুরুষদের নামাজে নারীদের ইমামতি করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে একমত। তবে নারীরা নারীদের নামাজে ইমামতি করতে পারবে। “বস্ত্রতপক্ষে আল মাজনি, আবু শাউর ও আল তাবারি ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের মতে পুরুষদের নামাজে নারীরা বৈধভাবেই ইমামতি করার যোগ্য। তারা বলেন, যার নামাজ বৈধ সে বৈধভাবে ইমামতি করারও যোগ্য।” উম্মি ওয়ারাকারের একটি হাদিসে উপরিউক্ত বক্তব্যের সমর্থন মেলে। “রসুল (দ:) তাকে তাঁর পরিবারের (উম্মি ওয়ারাকার) নামাজে ইমামতি করতে প্রেরণ করেছিলেন।” ইবনে দাউদ কর্তৃক বিধৃত এই হাদিসটি ইবনে খুজাইমাহ কর্তৃক বৈধ বলে গৃহীত হয়। উম্মি ওয়ারাকারের হাদিসটিতে স্পষ্টভাবেই বলা আছে যে, নামাজে যদি বয়স্ক পুরুষরাও থাকে সে ক্ষেত্রেও নারীদের ইমামতি বৈধ। এই যুক্তিটি আরেকটি তথ্য দ্বারা

সমর্থিত। আর তা হলো উম্মি ওয়ারাকার যে নামাজে ইমামতি করেছিলেন সেই নামাজে অনেকের সঙ্গে একজন বৃদ্ধ পুরুষ মানুষও ছিলেন, ওই নামাজে যিনি আযান দিয়েছিলেন।^৬

প্রকৃতপক্ষে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কেউই নেতৃত্ব দিতে পারে যদি তার নেতৃত্বের যোগ্যতা বা গুণাবলি থাকে। তবে ইসলামি বিধান অনুযায়ী নারীদের নেতৃত্বদানের অধিকার নেই বলে যা বলা হয়ে থাকে তা বৈধ কি অবৈধ তার প্রয়োজনীয় পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। যে কোনো জিনিস বোঝার জন্য আমাদের অবশ্যই স্বচ্ছ থাকতে হবে, ধর্মীয় বিধিবিধানের ক্ষেত্রে তো বটেই। অধিকার ও দায়িত্বকে একই সঙ্গে উপলব্ধি করতে হবে। এখানেই নারী উলেমাদের গুরুত্বের কথা আসে। ইসলাম সম্পর্কিত আলোচনায় পুরুষ উলেমাদের বিপরীতে নারী উলেমাদের প্রকাশ্য ও সক্রিয় ভূমিকা অতি জরুরি। এতোকাল ধর্মীয় আলোচনায় পুরুষদের একাধিপত্যই পরিলক্ষিত হয়েছে। পুরুষ উলেমারা বিশেষভাবে নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়েও সিদ্ধান্ত দিয়ে আসছেন। তাই নারীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে যারা অবহিত আর সেই সমস্ত আশা যেগুলো ধর্মীয় আইন বা ফিকাহভুক্ত হওয়ার যোগ্য সেগুলোর দায়িত্ব নারীদের ওপর থাকা বাঞ্ছনীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একবার এক মাহফিলে উমর (রা:) নারীদের দেনমোহর হ্রাসের কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে এক নারী হাত তুলে বলেন, হে খলিফা! আল্লাহ এর অনুমতি দিয়েছেন, আপনি কেন এটা নিষেধ করছেন?” এ কথা বলা শেষ করেই নারীটি দ্রুত সুরা নিসা’র ২০ আয়াতের উদ্ধৃতি দিতে শুরু করেন, আর যদি এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী নেওয়া ঠিক করে থাক আর তাদের একজনকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাক তবুও তার কাছ থেকে কিছুই নেবে না.....”। “উমর (রা:) এক মুহর্ত চুপ করে থেকে বললেন, আপনি সঠিক, আমারই ভুল হয়েছে।” ধর্মীয় পাঠ্যক্রমে ভারসাম্যের জন্য শিক্ষিত নারী উলেমাদের উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজন। পুরুষ উলেমাদের চ্যালেঞ্জ করার জন্য নয়, সাধারণত যাদের বিচক্ষণতা খলিফা উমরের চাইতে নিচু স্তরের। তবে আরো একবার ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।^৭

তথ্যসূত্র ও টিকা নির্দেশ :

১. হক, মাহমুদ, শামসুল, নারীকোষ, হাতেখড়ি (২০০৫), ঢাকা, পৃ. ২২৭।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।
৩. সংকলিত, মাসুদী, মাসদার এফ, ইসলাম ও নারীর প্রজনন অধিকার, ম্যাস-লাইন প্রিন্টার্স (২০০৫), ঢাকা, পৃ.-২৬।
৪. হক, মাহমুদ, শামসুল, নারীকোষ, হাতেখড়ি (২০০৫), ঢাকা, পৃ. ২২৭।
৫. সংকলিত, মাসুদী, মাসদার এফ, ইসলাম ও নারীর প্রজনন অধিকার, ম্যাস-লাইন প্রিন্টার্স (২০০৫), ঢাকা, পৃ.-২৬।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-৩০।

*সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
সরকারি সংগীত কলেজ, ঢাকা

সম্পাদকীয়

প্রতিটি মানুষ পরিচিতি লাভ করে তার কর্ম দ্বারা এবং এই কর্মই নিশ্চিত করে তার মর্যাদা। আবহমানকাল ধরে নারীর যে শাস্ত্রত কর্মরূপ তা নারীর এক পাক্ষিক পরিচয় বহন করে আসছে। অর্থাৎ নারীকে কেবল মা, স্ত্রী, বোন, কন্যা প্রভৃতি রূপে ভূমিকা পালনকারী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কিন্তু মানুষ হিসেবে নারী যে অধিকতর মানবিকতাসম্পন্ন কর্মী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় চরিত্রের অধিকারী তা বিবেচনাহীন রয়ে গেছে। দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য, চিন্তাভাবনায় সংকীর্ণতা, সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার অভাবে আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের নারী সমাজকে সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখছি। কিন্তু সময় এসেছে সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ওঠে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই বিবেচনা করার।

সম্পাদনা পরিষদ

ড. ফিরোজা বেগম
লেলিন আজাদ
সামসুন্নাহার মনি

লেখা আহবান

সমাজের নানা অসঙ্গতি-বৈষম্য কি আপনাকে ভাবিয়ে তোলে? আপনি কি সামাজিক কুসংস্কার ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দূর করতে বন্ধপরিকর? আপনি কি আপনার লেখনি দ্বারা সচেতন জনসমাজ গড়ে তুলতে চান? তাহলে আপনি যেই হোন, বাংলাভাষায় প্রকাশিত সচেতনতা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা সচেতন বার্তায় লেখা পাঠাতে আজই যোগাযোগ করুন নিম্ন ঠিকানায়।

সাপা’র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

আপনি কি আপনার প্রতিষ্ঠান বা ঘরে বসেই নিয়মিত ত্রৈমাসিক সচেতন বার্তা পড়তে চান? তাহলে বাৎসরিক দুইশত টাকা প্রদান সাপেক্ষে আজই গ্রাহক হোন। আমরা গ্রাহকদের নিয়মিত কুরিয়ার বা ডাকযোগে সচেতন বার্তা প্রেরণ করে থাকি। বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন নিম্ন ঠিকানায়।

সোশ্যাল এওয়ারন্যাস প্রোগ্রাম ফর অল (সাপা)
মধ্যেরচর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা থেকে ফজিলাতুন নেসা কর্তৃক প্রকাশিত
মোবাইল : ০ ১ ৭ ১ ৬ ০ ৫ ৬ ১ ৯ ২
ই-মেইল : apamskd@gmail.com
মূল্য : ২৫ টাকা